প্রাসাদ চক্রান্ত ও বাংলাদেশ

হিফজুর রহমান

১. নির্দলীয় নিরপেক্ষ (!) তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের শপথ গ্রহনঃ নীল নকশার দ্বিতীয় পর্ব

সারাদিন ব্যাপি অনেক উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে সময় কাটানোর পর বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ০৫ মিনিটে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দীন আহমেদ বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ (!) তত্ত্বাবধায়ক সরকার-এর প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহন করেন। মাত্র দশ মিনিটের এই অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন চোদ্দ দল, নব গঠিত এলডিপি এবং অন্যান্য বিরোধী দলের কোন নেতা বা কেউই উপস্থিত ছিলেননা। সুশীল সমাজের কাউকেও এই অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি। অবশ্য অত্যন্ত কম সময়ে নেয়া এই সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত কেউ বুঝে ওঠার আগেই শপথ গ্রহন হয়ে যায়। এখবর ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে কর্ণফুলির পাঠকরাও নিশ্চয়ই অ্যাতোক্ষনে পড়ে ফেলেছেন। সুতরাং এপ্রসঙ্গে পরে আসছি।

২. প্রসঙ্গ ১৯৯৬

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) তখনো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। বিচারপতি হাবিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ গরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হবে সে কথা তদানীন্তন বিএনপি বা তার নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বোধহয় বিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু, গোয়েন্দা সংস্থা সমূহের রিপোর্ট এবং বিদেশী দূতাবাসগুলোর পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, আওয়ামী লীগ জিতবে এবং সরকার গঠনের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর বিএনপি হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কারণ, তাদের সব তাবড় নেতা ও মন্ত্রী সকল ভূমিস্মাত হয়ে ছিলেন।

এই ফলাফল মানাটা বড়োই কষ্টকর হয়ে পড়েছিল বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে। তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিএনপি'রই একান্ত বিশ্বাসী আবদুর রহমান বিশ্বাস। বেগম জিয়া তখন ফলাফল মানিনা বলে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়ে নির্বাচনের ফলাফলটাকে ভন্ডুল করে দিয়ে আওয়ামী লীগের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়া। বিশ্বাস তৈরী ছিলেন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার জন্যে। ঢাকা শেরাটনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়া নির্বাচনী ফলাফল না মানার ঘোষণা দেবেন, আর বিশ্বাসও দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশংকা প্রকাশ করে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে দেবেন।

সবই ঠিক ছিল, কিন্তু বাদ সাধলেন উন্নত বিশ্বের ছয়জন প্রভাবশালী কূটনীতিক। সংবাদ সম্মেলনের আগে তারা খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন, এরকম কোন পদক্ষেপ নিলে তারা বাংলাদেশের ওপর থেকে সব সমর্থন প্রত্যাহার করবেন। এই হুমকিই কাজে লাগলো। বেগম খালেদা জিয়া সব বিষ হজম করে ফেললেন। সংবাদ সম্মেলনে ক্ষতিকর কিছুই বললেন না। দেশ ও জাতি এক ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেল। আর আওয়ামী লীগ গেল ক্ষমতায়। আমি তখন ঢাকাস্থ অস্ট্রেলীয় দূতাবাসের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকর্তা হিসেবে এই ঘটনাগুলো অনেক কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। এসম্পর্কিত একটি রিপোর্ট ঢাকার দৈনিক জনকণ্ঠে ব্যানার হেডলাইন দিয়ে ছাপাও হয়েছিল।

৩. ২০০১-২০০৫ঃ খালেদা জিয়ার জোটের শাসন। ক্ষমতাচ্যুত হবার আশংকাঃ নীল নকশার প্রথম পর্ব

২০০১ সালের নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার দল বিএনপি ও তার দোসর জামায়াত দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসেন। আওয়ামী লীগ তার অপশাসনের মূল্য দিল এই নির্বাচনে হেরে। তবে, ক্ষমতায় এসে কিন্তু বিএনপিও ভুলে যায় যে, এই ক্ষমতা কেবলই পাঁচ বছরের। দলের প্রভাব বলয় দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে তারা বেঁধে ফেলতে চায় গোটা দেশকে। গগনচুম্বি দূর্নীতি, দুঃশাসন ও অপশাসন এবং নৈরাজ্যে দেশ ছেয়ে যায়। আর বিএনপি ও তার দোসররা কেবলই উন্নয়নের জোয়ারের ডুগডুগি বাজাতে থাকে। ফলাফল, সাধারণ মানুষের পিঠের আর পেটের চামড়া এক হয়ে যেতে থাকে এবং শহীদ জিয়ার ভাঙা স্যুটকেস থেকে বেরিয়ে তার পরিবারের জন্যে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ একীভূত হতে থাকে। শোনা যায় বিশ্বের এহেন ব্র্যান্ডের গাড়ি নেই যা খালেদার সুপূত্র বিএনপি'র একমাত্র উদীয়মান নেতা তারেক জিয়ার গাড়ির ফ্লিটে নেই। দলের শীর্ষ স্থানীয়দের দূর্নীতি দেখার পর বাকিরা বসে থাকবেন কেন। ফলাফল, অনেক যদু মধুই এখন অনেক অনেক কোটি পতি, যার হিসেব করতে গেলেও মাথা ঘোরে। দূর্নীতির করাল গ্রাসে দেশের প্রকৃত উন্নয়নের চাকায় খিল পড়ে গেল, আর বিএনপি'র নেতাদের মুখে উন্নয়নের খই ফুটতে থাকলো। এরই মধ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশকে পরপর চারবার সর্বোচ্চ দূর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে পুরস্কৃত করলো। আগামী ডিসেম্বরে যে ট্রান্সপারেন্সির রিপোর্ট প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তাতেও সম্ভবত বাংলাদেশের এই অবিস্মরনীয় কীর্তি কেউ কেড়ে নিতে পারবেনা। যাই হোক, জোট সরকারের উন্নয়নের খই যতোই ফুটুকনা কেন, বিদ্যুতের দাবিতে, অসহনীয় দ্রব্যমূল্য কমানোর দাবিতে, সব কিছুর দলীয়করণ বন্ধের দাবিতে, দুর্নীতি বন্ধের দাবিতে জনরোষ ফুঁসে ওঠার সাথে সাথে ক্ষমতাসীনদের ভেতরে কাঁপন ধরলো। ২০০৭ সালের নির্বাচন যদি সত্যিই স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ হয় তাহলে সেটার বৈতরণী পার হবার সম্ভাবনা যে নেই সেটাও তারা বুঝতে পারলো। সুতরাং এই নির্বাচন জেতার জন্যে প্রশাসনকে নিজেদের মতো করে ঢেলে সাজানোর কাজটা তারা করে ফেললো অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে। ২০০১ সালের উপ সচিব রেকর্ড সৃষ্টি করে সচিব পর্যন্ত হয়ে গেলেন কেবল বিএনপি'র প্রতি আনুগত্য প্রকাশের কারণে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানও যাতে নিজেদের লোক হয় সেটার ব্যবস্থাও করে ফেললেন তারা। বিশদ এই নিবন্ধে লিখছিনা। তাতে সাতকাহন হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন অনিয়ম নিয়ে বিশদ লেখা যাবে।

কিন্তু, ভবি ভোলার নয়। বিরোধী দলগুলো এবার একাট্টা হলো সত্যিকারের একটি নির্দলীয় সরকারের দাবিতে। তারা বললো, সংবিধান সম্মত উপায়েই তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা যেতে পারে, তবে বিচারপতি কে এম হাসান নয় কিছুতেই। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পূর্বকালে ইয়াহিয়া সরকার আলোচনার নামে শেখ মুজিবকে যেমন বোকা বানিয়েছিল, ঠিক তেমনি বোকা বানালো এবার স্বাধীন বাংলাদেশের খালেদা সরকার। তারা বিরোধী দলের দাবি নিয়ে সংলাপ অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিল। সংলাপ শুরু হলো দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে। তবে, সংবিধান রক্ষার নামে কে এম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করার সিদ্ধান্তে তারা অটল রইলো। শেষ পর্যন্ত ঈদের ঠিক আগেই সংলাপও ভেস্তে গেল। কিন্তু, ২৭ অক্টোবর থেকে রচিত বিরোধী দলের গন আন্দোলন প্রচন্ড রবে ফুঁসে উঠলো। ঢাকা সহ সারা দেশ অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। দেশ চলে গেল কার্যতঃ বিরোধী দলগুলোর হাতে। ঢাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো সারা দেশ থেকে। এরই মধ্যে বিএনপি থেকে কর্নেল (অবঃ) অলি'র নেতৃত্বে একগাদা মন্ত্রী ও এমপি খালেদা-তারেকের দুর্নীতির ও পরিবারতন্ত্রের প্রতিবাদে দল ছেড়ে গিয়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিএনপি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সাথে মিলে গঠন করলেন লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এলডিপি)। এরই মধ্যে আবার বিচারপতি কে এম হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হতে অপারগতা জানিয়ে বসলেন। সব মিলিয়ে বিএনপি'র সব উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার বাড়া ভাতে ছাই পড়ার উপক্রম হলো। এবার নীল নকশার পরবর্তি পর্ব বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করার সময় হলো ।

৪. নীল নকশার চূড়ান্ত পর্বের আগের পর্ব

গত প্রায় এক মাসেরও বেশি সময় ধরে দেশময় কিছু কথা ভেসে বেড়াচ্ছিল। সেগুলো হলো, শেষপর্যন্ত বিচারপতি কে এম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করতে ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রপতিকেই তার দায়িত্বের বাড়তি হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব দেয়া হবে। এজন্যে সংবিধানে প্রদত্ত মাঝের অপশনগুলো ওভারটেক করতে হলেও করবে ক্ষমতাসীনরা। সেটাও বিরোধী দল না মেনে আন্দোলন সংগ্রাম চালাতে থাকলে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা প্রয়োজনে জরুরী অবস্থা জারী করবেন এবং সেনা বাহিনীকে সামনে নিয়ে আসবেন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে সাংবিধানিক শক্তির বলে। কারণ, রাষ্ট্রপতি হিসেবে ইয়াজউদ্দীন আহমেদ তখন সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক থাকবেন এবং প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান। ফলে, এরকম কোন ব্যবস্থা গ্রহনে তার কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। এরপর বাকি রইলো নীল নকশার নির্বাচনে বিএনপিকে বিজয়ী করা। ইতোমধ্যেই দলীয়করণকৃত প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, পুলিশ বাহিনী একাজে যথেষ্ঠই সহায়ক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর সামরিক বাহিনী থাকবে বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনের নামে তথাকথিত নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা (!) রুখে দেয়ার জন্যে। এর পর কিস্তিমাত হতে আর বাকি কি?

ওইসব গুজবকেই বাস্তবে পরিণত করে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দীন আহমেদ প্রধান উপদেষ্টা হলেন আজ। বাকি সব কিছুই হিসাব মতো হবে এরকমই আশা করে বিএনপি নেতৃত্ব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। খালেদা তনয় তারেক দু'দিন চুপ থাকার পর আজ এক টিভি সাক্ষাতকারে বলেছেন, দেশে শান্তি রক্ষার প্রয়োজনে শক্তিও প্রয়োগ করতে হতে পারে। ইয়জউদ্দীন আহমেদও প্রধান উপদেষ্টা হবার পর জাতির উদ্দেশে দেয়া প্রথম ভাষণে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহের সবখিছুই ব্যবহার করা হবে। এই কথার মধ্যে পূর্বেল্লিখিত গুজবসমূহের বাস্তবতাও কি লুকিয়ে নেই?

আওয়ামী লীগ সহ অন্য সব বিরোধী দল ইয়াজউদ্দীন আহমেদকে প্রধান উপদেষ্টা পদে প্রত্যাখ্যান করেনি, আবার গ্রহনও করেনি। তাদের ঘোষনানুযায়ী অবরোধ কর্মসূচি আগের মতোই চলতে থাকবে। সুতরাং এই নৈরাজ্য (!) ঠেকাতে ইয়াজউদ্দীন সংবিধানের নামে বাকি সব কিছু করে ফেললেই হয়। তাতেই দেশে আবার লুটেরা ও পরিবারতন্ত্রের পথ আরো সুগম হতে পারবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৫. পাদটিকা

অ্যাতোসব কিছুর পর দেশের মানুষের কি অবস্থা? রাজনৈতিক দলগুলোর খেয়োখেয়ির মধ্যে এবং গনতন্ত্রের নামে অন্তঃসার শুন্য রাজনীতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আর যাই হোক জনমানুষের কষ্ট কখনো লাঘব হয়না। আর নীল নকশা সব যেভাবে বাস্তবায়িত হতে শুরু করেছে তাতে গনতন্ত্র মারা গেলেও অবাক হবার কিছুই থাকবেনা। দেশবাসীকে এখন আরো অনেক অঘটনের জন্যেই প্রস্তুত হতে হবে। সব নীল নকশাই যে পরিকল্পনা অনুসারে বাস্তবায়িত হবে সেকথাও বা কে বলতে পারে? বিএনপি'র ক্ষমতার মসনদও যে অটুট থাকবে এবং লুটের সব মালও ভোগ করতে পারবেন সবাই এমন নিশ্চয়তাই বা কে দেয়? কারণ, পুনর্বার মসনদ এখনো অনেক দূর। যাদের ওপর ভর করতে চাইছেন তারা, তারাও কতোদিন বিশ্বস্ত থাকবে কে জানে? পাশা উল্টে যাবার ঘটনা যে এদেশেই ঘটেছে বহুবার!

হিফজুর রহমান, প্রাক্তন সিনিয়র কুটনৈতীক সহযোগী, গবেষক ও বিখ্যাত সাংবাদিক, ***ঢাকা, ২৯ অক্টোবর (রাত ১১-৩০মিনিট)।***

প্রতিবেদকের পরিচিতি জানতে উপরে তাঁর ছবিতে টোকা দিন।